গল্পে আঁকা জীবন

ইসমাইল রফিক

মাকতাবাতুল হাসান

গল্পে আঁকা জীবন
প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৬
সর্বশেষ সংস্করণ : মে ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসান এর পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক

মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

ISBN : 978-984-8012-28-4

মুল্য : ১০০/- টাকা

GOLPE AKA JIBON
by ISMAIL ROFIQ
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh.
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan Web : www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

মাওলানা লিয়াকত আলী
জগলুল হায়দার
ও মুফতি নূরুল্লাহ খালিদ
সাহিত্যের পথচলায় যাঁরা আমার প্রেরণা।

সূচিপত্র

ত্যাগ	১১
ধূসর জীবন	১৪
প্রজাপতি	১৭
জোবেদার দুষ্টু ভাইটি	২১
একটি গাঁয়ের করুণ চিত্র	২৪
এডভ্যাঞ্চার	২৬
ননীর আম্মু	২৯
কৃতজ্ঞ পিঁপড়ে	৩৩
মুরগি ও বিড়াল	৩৭
একজন মাস্টার আমজাদ আলী	৪০
হারিকেন	৪৪
দেয়াল	৪৬
ঘোড়া ও হরিণের গল্প	৪৯
চড়াই পাখির গান	৫১
অনুশোচনা	৫৫
মায়া এখন বেশি মায়াবী	৫৮
টেলিফোন	৬২

প্রসঙ্গ কথা

তাকিয়ে আছি আমি। স্থির তাকিয়ে আছি। পাণ্ডুলিপিটির দিকে। এসব গল্প কি তবে আমারই সৃষ্ট! আমারই অনাকাঙ্ক্ষিত সারল্য! কিছুই বলার নেই। সবই আল্লাহর তায়ালার মর্জি। সবই বান্দার প্রতি তাঁর করুণা।

গল্পের জগতে আমি নিজেকে জড়াতে চাইনি। এ কথা সত্য। কারণ, আমার পুরো সত্তায় মিশে ছিলো অন্যকিছু। মিশে ছিলো ছড়া ও কবিতা। রাতের পর রাত। দিনের পর দিন। আমি বিরামহীন সাধনা করেছি। শুধু অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসেরই জন্য। *'ইচ্ছে ডানার কিচ্ছেগুলো'* সে সাধনারই ফসল। কিন্তু সেই আমি হঠাৎ গল্পে কেন জড়ালাম? বলতে গেলে, আমি এখন যতটা কাব্যিক, তারচেয়েও বেশি গল্পময়। কারণ, পরিণত বয়সে আমাকে নাড়া দিয়েছিলো আল্লামা ইকবালের জীবন। আমি পেয়েছি একটি নতুন দিগন্ত। একটি আশার আলো। সে এক অন্য ইতিহাস। আরেকদিনের জন্য পড়ে থাকলো।

গল্পগুলো দায়সারা নয়। নিতান্ত দায়বদ্ধতা থেকেই লেখা। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে মিশে আছে সুস্থ মনন তৈরির অঙ্গীকার। আছে অনৈতিকতার বিরুদ্ধে মৌন প্রতিকার। সুস্থ বিনোদনে মানবিক হোক অন্তপ্রাণ। জেগে উঠুক বোধ ও বিবেক। পৃথিবী সমৃদ্ধ হোক অপার কৈশোরিক সৌন্দর্যে। এ-ই প্রত্যাশা।

– ইসমাইল রফিক
মোবাইল: ০১৭২১৮১২৮৮২
ইমেইল: ismailbinrafiq@gmail.com

ত্যাগ

–"চৌধুরি সাহেব! পানি তো অনেক উপরে উঠে এসেছে। পাহাড়ে মেঘ জমেছে। বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এখন তো অবশ্যই কিছু ভাবতে হয়।" ভরাট গলায় কথাগুলো বললেন মুনশি নাজিমুদ্দিন আহমদ।

–"হুম ...।" চৌধুরি হক নাওয়াজের গম্ভীর গলার এটুকু আওয়াজই শোনা গেলো।

চৌধুরি হক নাওয়াজ ও মুনশি নাজিমুদ্দিন আহমদ একটি উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ঢল সাঁপের মতো ফণা তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। সরকারীভাবে তৈরি করা হয়েছিলো এই নালা। পাহাড়ের পানিতে গাঁয়ের মানুষের চাষবাসের সুবিধের জন্য।

সেই কত বছর আগের দেয়াল। খুব উঁচু করেই তৈরি করা হয়েছিল। কোনো দিন পাহাড়ের পানি দেয়াল টপকাবে তো দূরের কথা অর্ধেকও হতে পারেনি। আর আজ? এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য কেউ তৈরি ছিলো না। প্রতিবেশি দেশ ফারাক্কা বাঁধ ছাড়াতেই যতসব অঘটন। এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় তাই ভাবছেন তারা।

চৌধুরি সাহেব একবার ডান দিকে তাকান। দৃষ্টি যতদূর যায় সবটুকুই তার জমিন। সবটুকু জমিন জুড়েই ধান করেছেন। দু'একটা শিষ গজালো মাত্র। দখিনা বাতাস দোলা দিচ্ছে। ঢেউয়ের মতো দুলছে পুরো সবুজের সাগর। ক্ষেতের মাঝখানে তিনি একটা খামার করেছেন। ইদানীং তিনি সেখানেই থাকেন। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার তিনি বাঁ দিকে তাকান। একটি গাঁয়ের মলিনতা তাকে ভাবায়। ওরা মাটির ঘর-দোরে থাকে। ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। অন্যের কাজ করেই দু'মুঠো আহার

জোগাড় করে। এককথায় গ্রামটি নিম্নবিত্তের করুণ এক ক্যাম্পাস। তিনি কী করবেন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। অথচ পানিগুলোকে যেকোনো একদিকে যাওয়ার পথ করে দিতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? চৌধুরি সাহেব তার বাংলোর দিকে হাঁটা দিলেন।

দ্বিতীয় দিন। মুনশি নাজিমুদ্দিন আবারো এলেন চৌধুরি সাহেবের বাংলোয়। সাথে নিয়ে এলেন কয়েকজন দিনমজুর। দেয়ালকে একদিক দিয়ে ভাঙতেই এদেরকে নিয়ে আসা। এসেই তিনি চৌধুরি সাহেবের কানে কানে বললেন– "চৌধুরি সাহেব! এখন আর ভাববার সময় নেই। জলদি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনার ক্ষেত-খামার বাঁচাতে হলে দেয়ালটিকে বাঁ দিক দিয়েই ভাঙতে হবে।" চৌধুরি হক নাওয়াজ বলে উঠলেন– "নাজিমুদ্দিন সাহেব! ভাঙার কাজ এত সহজ নয়। সরকারিভাবে অনুমতির প্রয়োজন আছে।"

–"সরকার? আমাদের ছোট চৌধুরি সাহেব এবার এমপি হয়েছেন। আবার ওদিক দিয়ে সরকারি দলেরও সদস্য। তাহলে অত জটিলতা কিসের?"

–"নাজিমুদ্দিন সাহেব! এখানে এক-দুই পরিবারের নয়; বরং হাজার মানুষের জটিলতা।"

–"চৌধুরি সাহেব! আপনি যদি নিরাপদ থাকেন তাহলে ওদেরকে নিয়ে ভাবতে পারবেন। কিন্তু আপনিই যদি ডুবে যান তাহলে তো সবই শেষ।

–"ঠিক আছে। আমি হাশমতের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে নিই।" চৌধুরি হক নাওয়াজ এ কথা বলেই বাংলোর ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

আরো একটা দিন পেরিয়ে গেলো। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না চৌধুরি সাহেব। টেলিফোনে কোথায় যেন কথা বললেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায়? এর একটা বিহিত না করেই? অবশেষে চৌধুরি সাহেবের দেখা মিললো। তিনি তার এমপি ছেলের গাড়ি থেকে

নামলেন। নেমে সোজা বাংলোর দিকে হাঁটা দিলেন। তার চেহারায় চিন্তার ছিটেফোঁটাও কেউ দেখতে পেলো না। মনে হয় তিনি এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তিনি চাইলে কী না করতে পারেন। তার ছেলে এমপি। তিনি এলাকার মাতবর। সবাই তাকে ভয় পায়। মান্য করে। আজও তিনি কাউকে কোনো সিদ্ধান্ত শোনালেন না। এ রাতে ঘুমালেনও অনেক দেরি করে। অনেক রাত পর্যন্ত পায়চারি করলেন তার বাংলোর বারান্দায়।

পরদিন সকালে মুনশি নাজিমুদ্দিন আহমদ পুলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার কয়েকজন রাজমিস্ত্রি। দেয়াল ভাঙার জন্যেই এদেরকে আনা হয়েছে। নালার পানি এখন শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে গড়িয়ে পড়ছে দু'ধারেই। তিনি মিস্ত্রিদের বাঁ দিকের দেয়ালটি ভাঙতে ইঙ্গিত করলেন। ওমনি চৌধুরি সাহেব দৌড়ে আসতে আসতে বললেন– "বাঁ দিকের দেয়াল নয়; বরং ডান দিকের দেয়ালই ভাঙা হবে।" সবাই অবাক। নাজিমুদ্দিন সাহেব তো বলেই ফেললেন– "ডান দিকের? জনাব! আপনার ক্ষেত-খামার সব যে ডুবে যাবে।"

– "নাজিমুদ্দিন সাহেব! এ দিকে আমার একার একটু ক্ষতি। আর ওদিকে হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি। এদিকে আমার সামান্য ফসল আর খামারবাড়ি। আর ওদিকে তাদের জায়গাজমি ঘরদোর বাগানবাড়ি সব। তোমাদের এই চৌধুরি সাহেব না হয় নিজের ক্ষতি বরদাশত করতে পারবে। কিন্তু ওদের কী হবে? তাদের তো নষ্ট হয়ে যাবে পুরো জীবন।" চৌধুরি হক নাওয়াজ সাহেব কথাগুলো বলেই শাবল তুলে নিলেন। এগিয়ে গেলের নিজের ক্ষেতের দেয়ালের দিকে। দেখাদেখি সবাই এগুলো সে দিকে। সবার হাতেই হাতুড়ি কিংবা শাবল। একটু পরেই তৈরি হলো একটি গর্ত। আর সেখান থেকে আহত নাগের মতো বেরিয়ে এলো পানির প্রবাহ। আর ছুটে চললো সবুজের প্রান্তর দুমড়ে-মুচড়ে।

ধূসর জীবন

আকাশে চাঁদটি আজ অনেক বড় হয়ে ওঠেছে। চৌদ্দ কি পনেরো তারিখের চাঁদ। ফকফকা জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মরুভূমির বালুরাশি মুক্তোর মতো চিকচিক করছে। পাহাড়ের ওপাশে কতগুলো তারা নেভে আর জ্বলে। প্রকৃতিতে ভর করে আছে মাঝরাতের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ ঢেকে দিলো চাঁদের মুখ। ওমনি জবজব করে বৃষ্টি নামলো। আহা! পানিগুলো কত স্বচ্ছ! কত ঠাণ্ডা! কত পবিত্র!

সে আঁজলা ভরে তুলে আনে বৃষ্টির পানি। ঢেলে দেয় শুকনো গলায়। আবার তুলে আনে। আবার পান করে। আহা! কত দিন পর আজ একটু সুমিষ্ট পানি পান করছে সে। সেই কত দিন হয়ে গেলো।

এখানে মানুষ আর পশুর জীবন একাকার হয়ে মিশে গেছে।

এখানে দুর্ভিক্ষ লেগেছে।
বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।
খাবার নেই।
পানি নেই।
প্রয়োজনীয় ওষুধপাতি নেই।
সবাই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।
কি করে মানুষ এভাবে বেঁচে থাকে?
বাধ্য হয়েই?
বাধ্য হলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে।
কিন্তু আর কতো?

তার দু'চোখ থেকে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। গায়েবী মদদের জন্য সে ফরিয়াদ করে আল্লা'র কাছে।

দলে দলে মানুষ শহরের দিকে ছুটছে। একটু পানির আশায়। একটু খাবারের আশায়। একদিন তারাও বেরিয়ে পড়ে। তার বাবা, তার মা, ছোট বোন মারওয়া এবং সে। অনেক দূরের পথ। অসুখ বাধিয়ে বসেছে মারওয়া। প্রচণ্ড জ্বরে চোখমুখ সব বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে তো আর বসে থাকা যায় না। শহরে সরকারি হাসপাতাল থেকে ওষুধ নেওয়া যাবে। মারওয়াকে তার মা আঁচল দিয়ে পিঠে শক্ত করে বাঁধে। হাঁটতে থাকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দিন পেরিয়ে রাত নেমে আসে। রাত পেরিয়ে আবার উঁকি দেয় রঙিন সূর্য। তারা ছুটে চলছে তো চলছেই।

লম্বা লাইন করিডোর পেরিয়ে মাঠেও গড়িয়েছে। ওষুধের জন্য মানুষের হাহাকার। তার বাবা গিয়েছে এক মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করতে। তার মা মারওয়াকে কোলে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনেক লম্বা লাইন। শক্তি কুলোয় না। তবুও তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্ষুধার চেয়ে মারওয়ার চিকিৎসাই এখন বড়। ধীরে তিনি এগুতে থাকেন সামনের দিকে। আর একটু আগালেই তার পালা। ঠিক এমন মুহূর্তেই তার মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মারওয়া ততক্ষণে পাড়ি জমিয়েছে না ফেরার দেশে। তার মা হাউমাউ করে কাঁদেন। মায়ের সাথে সেও আওয়াজ করে কাঁদে। কিন্তু কারও চোখেই পানি নেই। সবার পেটেই যে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন।

কেঁদে-কেটে বুকটা একটু হালকা হলো। সেখান থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে। বসে পড়ে একটি বালুর স্তুপের উপর। মুক্তোর মতো চমকাচ্ছে বালুর কণাগুলো। তার চোখ কেমন যেনো ঘোলাটে হয়ে আসছে। পেটের ভেতরে প্রচণ্ডভাবে নড়ে ওঠে ক্ষুধা। এই যেন প্রাণ বের হবে হবে করছে। হঠাৎ সে দেখতে পায়– দূরে কোথাও যেন মেঘ জমেছে। বৃষ্টির শব্দরা ভেসে আসছে। গাছপালা সজীব হয়ে উঠছে। পাখিরা ডানা মেলে দিচ্ছে দিগন্তে।

সে কি স্বপ্ন দেখছে?
প্রজাপতির ডানার মতো রঙিন স্বপ্ন?
ভোরের শিশিরের মতো তরল স্বপ্ন?
স্বপ্ন এবং স্বপ্ন।

সে এগিয়ে চলছে স্বপ্নের দেশে। দু'ঠোঁটে তার শুষ্ক হাসি। একটি মধুর ধ্বনি শুনতে পায় সে। ঠিক যেনো চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ। অই তো। সেই স্বপ্নের দেশে ছুটে চলছে একটি উটের বহর। সেখানে বসে আছে সুন্দরতম রমণীরা। তারা এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। সে তাদের অনুসরণ করে। তাকে কেউ পিছন থেকে ডাকে। তার বাবা? তার মা? অনেক মানুষ? কিন্তু কিছুই সে কানে তোলে না। আজ কারো প্রতিই যেন মোহ নেই তার। সে এগিয়ে চলছে তো চলছেই।

সামনে তার জান্নাত। যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে তারই বোন মারওয়া।

সেও ছুটে চলেছে না ফেরার দেশে।

তার বাবা তখনো ফিরে আসেনি। হয়তো আর কখনোও ফিরবে না!